দ্য লস্ট বুকশপ

ইভি উডস

অনুবাদ: অনির্বাণ ভট্টাচার্য
সম্পাদনা ও টীকা: সজল চৌধুরী

কপিরাইট সংক্রান্ত নোটিশ

PROPRIETOR:

Anda Podaru (Jan 29, 2025 12:33 GMT)

LICENSEE:

আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা মেকানিক্যালি, যে-কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

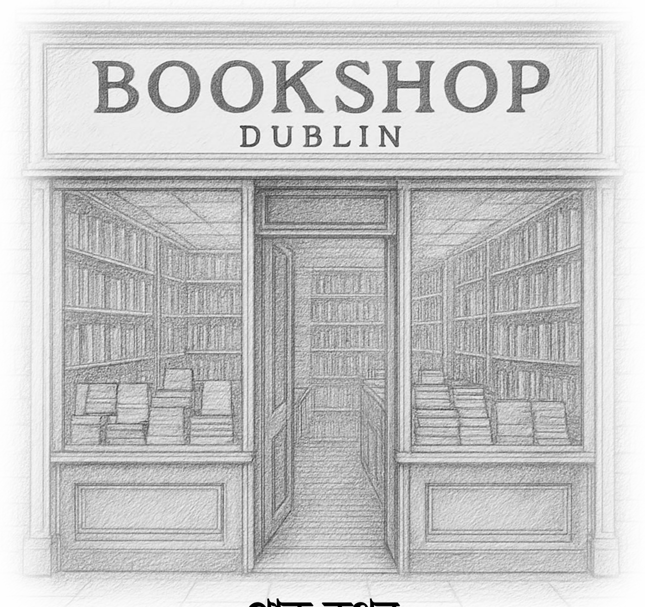

প্রাক কথন

শীতের সকালে বৃষ্টির মধ্যে, ডাবলিনের[১] রাস্তায় ছোটো ছেলেদের ঘুরে বেড়াতে খুব একটা ভালো লাগার কথা নয়। তবে সেই ছোট্ট ছেলেটি যদি একটি সুসজ্জিত বইয়ের দোকানের বাইরে কাচের পাল্লায় মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আলাদা কথা। দোকানের ভেতরে চকমকে আলোয় বইগুলোর সুদৃশ্য প্রচ্ছদ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই বইয়ে না জানি কত রোমাঞ্চকর গল্পের সম্ভার রয়েছে। সেই কাচের ওপাশে সাজানো রয়েছে হরেক রকম সুদৃশ্য নতুন নতুন জিনিসের ডালি। ছোটো ছোটো গ্যাস বেলুন দোকানের প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। সুন্দর মিউজিক বক্সের ভেতর যান্ত্রিক পাখি ও বাজনার গতিবিধি দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকেই। ছেলেটাকে লক্ষ্য করে দোকানের ভেতর থেকে মহিলাটি হাতছানি দিয়ে ডাকেন। সেই ছোট্ট ছেলেটা লজ্জা পেয়ে মৃদু মাথা নাড়ায়।

তারপর কাচের ওপার থেকেই বলে, 'স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে।'

মহিলা রাগ করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

[১] আয়ারল্যান্ডের রাজধানী।

ছেলেটি সেকেন্ড তিনেক নিজের সাথে যুদ্ধ করে বলল, 'আচ্ছা এক মিনিট দেখেই নিই বরং।'

মহিলা কাউন্টারের ওপারে একটা বড়ো কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে আরও অনেক বই বের করতে করতে বললেন, 'ঠিক আছে, এক মিনিটের জন্য হলেও এসো,' মহিলা ছেলেটিকে এক ঝলক দেখে নিলেন। প্যান্টের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে তার জামা, দু পায়ে দুরকমের মোজা আর তার চুল দেখে দিব্যি বোঝা যায় যে বহুদিন সে চুলে চিরুনি পড়েনি। মহিলা মনে মনে হাসলেন। এই ওপালিনের বইয়ের দোকানটি ছোটো ছেলেমেয়েদের কাছে দারুণ আকর্ষণের জায়গা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ক্লাসে পড়ো?'

'সেন্ট ইগ্নেসিয়াসে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি।' জবাব দিতে দিতে ছেলেটি শূন্য থেকে ঝুলিয়ে রাখা কাঠের এরোপ্লেনের দিকে দেখছিল।

'জিনিসটা তোমার পছন্দ হয়েছে বুঝি?'

ছেলেটি কথাটা ভেবেই খানিক বিষম খেল। তিনি দেখলেন ছেলেটি ম্যাজিক শিক্ষার একটি পুরোনো বইয়ের পাতা উলটাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাউন্টারের কাছে এসে বিভিন্ন স্টেশনারি জিনিসপত্র দেখতে আরম্ভ করল।

'আমি একটা বইয়ের উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণপত্র পাঠাচ্ছি। তুমি চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারো।'

ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে মহিলাটির মতো করে কাগজ মুড়ে খামে ঢোকাতে শুরু করল। সে যেন এই কাজে কিছুটা বেশি উৎসাহ পেয়েছে। কাজ করতে করতে ছেলেটার নাকমুখ কুঁচকে যাচ্ছিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ও-পা-লি-ন মানে কী?'

'ওপালিন একটা নাম।'

'আপনার নাম?'

'না, আমার নাম মার্থা।'

ছেলেটা যে এই সামান্য ব্যাখ্যায় খুশি হয়নি তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

'তুমি চাইলে আমি তোমাকে তার গল্প বলতে পারি। তারও খুব একটা স্কুলে যেতে কিংবা নিয়ম মানতে ইচ্ছা করত না।'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আর তাকে যা করতে বলা হতো সেটাও করতে ইচ্ছা করত না?'

মার্থা রহস্যময়ী হাসি হেসে বললেন, 'সেসব তো তার একদম করতে ইচ্ছা করত না। তুমি এই চিঠিগুলো খামে ঢুকিয়ে ফেলো। আমি ততক্ষণে আমাদের জন্য চা বানিয়ে আনি। একটি ভালো গল্প সবসময় চায়ের সাথে শুরু হয়।'

প্রথম অধ্যায়

ওপালিন

লন্ডন, ১৯২১

আমি বইয়ের এম্বস[২] করা প্রচ্ছদের স্পাইনের ওপর দিয়ে আঙুল বুলাই। আমার জীবনে যে কাহিনি ঘটে চলেছে তার থেকে এই বইয়ের স্পর্শ অনেক বেশি সহজবোধ্য ও বাস্তব বলে মনে হয়। মা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার একুশ বছর বয়সি আমাকে বিয়ে করতে হবে। আমার ভাই লিন্ডন পারিবারিক ব্যাবসা সামলাতে শুরু করেছে। তাকে দূর দেশ থেকে কিছু একটা আমদানি করতে হবে। আমি তার কথা খুব একটা কানে নিচ্ছিলাম না।

মা নিজের চেয়ারের পাশের টেবিলে চায়ের কাপ-পিরিচ নামিয়ে রেখে বলল, 'তোমার বয়সি মেয়েদের কাছে দুটো পথ থাকে। একটি হলো বিয়ে করা, আরেকটি হলো নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে কোনো একটি কাজ জোগাড় করা।'

আমি একটু অবাক হয়ে বিড়বিড় করলাম, 'সম্ভ্রম?' চারপাশে ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে খসে পড়া রঙের ছোপ আর মলিন হয়ে আসা পর্দার কাপড়ের দিকে তাকিয়ে তার আত্মগর্বের মনে মনে প্রশংসা করলাম। তিনি নিজের থেকে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিলেন এবং আমার বাবা যাতে ব্যাপারটা ভুলে না যান সে ব্যাপারে মা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

আমাদের পরিচারিকা মিসেস ব্যারেট ছাই ঝাড়ছিলেন। লিন্ডন বলল, 'আপনাকে কি এখনই এসব করতে হবে?'

ভদ্রমহিলা ওর কথায় বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে জবাব দিলেন, 'ম্যাডাম আগুন জ্বালাতে বলেছিলেন,' আমাদের ছোটোবেলা থেকেই এই ভদ্রমহিলা এবাড়িতে কাজ করেন। তিনি কেবল মায়ের হুকুম মেনে চলেন। ভদ্রমহিলা এমন হাবভাব দেখান যেন আমরা, বাড়ির বাকি সদস্যরা এক-একটি ঠগ, প্রতারক।

লিন্ডন নিজের ওয়াকিং স্টিকে ভর করে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক

[২] কাগজ বা অন্যান্য উপকরণে উঁচু রিলিফ চিত্র ও নকশা তৈরি করার প্রক্রিয়া।

প্রান্তে সরে গিয়ে বলল, 'এখন কথা হচ্ছে, তোকে বিয়েটা করে ফেলতে হবে।' ভাই আমার থেকে আঠারো বছরের বড়ো। ফ্ল্যান্ডারের যুদ্ধে[৩] তার শরীরের ডান দিকটা সম্পূর্ণ বসে গেছে। বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই দিকটা। আমি যে ভাইকে চিনতাম সেই ভাই সমাধি নিয়েছে ওই যুদ্ধক্ষেত্রেই। তার চোখেমুখে যে ভয় দেখেছিলাম তা আমাকেও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সর্বসমক্ষে স্বীকার না করলেও মনে মনে তাকে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম। ভাই বলল, 'পাত্র ভালো। তোদের দুজনকে মানাবে সুন্দর। বাবার পেনশনে মা ঠিক করে সংসার চালাতে পারছে না। এবার বইয়ের পাতা থেকে মুখ বের করে বাস্তবের মুখোমুখি হও।'

আমি বইটাকে জড়িয়ে ধরলাম। এটা *উদারিং হাইটস*[৪]*-এর* একটি দুষ্প্রাপ্য আমেরিকান প্রথম সংস্করণ। বাবা নিজের পুস্তক প্রেমসমেত এই বইটি উপহার দিয়েছিলেন। কাপড়ে জড়ানো এই বইটাকে গুপ্তধনের মতো আগলে রাখি। ওর প্রচ্ছদে স্বর্ণালী অক্ষরে লেখা, 'জেন আইয়ারের লেখকের লেখা'। আমরা ক্যামডেনের চোর বাজার থেকে হঠাৎ এই বইটা পেয়ে গেছিলাম। তবে একথা আমরা মাকে বলিনি। পরে আবিষ্কার করি যে এমিলির ইংলিশ পাবলিশার জেন আইয়ারের খ্যাতিকে কাজে লাগানোর জন্যই এই ভ্রান্ত বিষয়টিকে সমর্থন করেছিলেন। আমরা যখন বইটি পেয়েছিলাম তখন এটি খুব সুন্দর অবস্থায় ছিল না। ছিঁড়ে গেছিল কাপড়ের প্রচ্ছদের কোনগুলো। আর কেউ এই বইয়ের পেছনে ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো খানিকটা অংশ কেটে নিয়েছিল। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কালক্রমে আলগা হয়ে এসেছিল বইয়ের বাঁধাই। ফলে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো খুলে আসছিল। তবে আমার কাছে বইয়ের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য খুবই প্রিয় ছিল। এই বইয়ের তামাকের মতো গন্ধটাও যেন আমাকে টাইম মেশিনের আস্বাদ দিত। হয়তো তখন থেকেই বীজ বপন করা হয়ে গেছিল। একটা বই দেখে যেমনটা মনে হয়, সেই বই আসলে তা নয়। বাবা ভেবেছিলেন যে আমার বইয়ের প্রতি প্রেম হয়তো আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। কিন্তু এই পুস্তক প্রেম ক্লাসের ক্ষেত্রে আমাকে অমনোযোগী করে তুলেছিল। আমি সব সময় কিছু না কিছু ভাবতাম। স্কুল শেষ হলে এক ছুটে বাড়ি ফিরে বাবাকে বলতাম বইটা আমায় পড়ে শোনাতে। তিনি একজন সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন। আজীবন সৎ এই মানুষটির বইয়ের প্রতি প্রেম ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি বলতেন, সফেদ কাগজের ওপর কতগুলো কালো অক্ষরের সমষ্টি মানেই বই নয়। বই হলো অন্য দুনিয়ায়, অন্য জীবনে পাড়ি দেওয়ার গোপন দরজা। আমিও ধীরে ধীরে বইয়ের প্রেমে

---

[৩] বর্তমান বেলজিয়ামের উত্তরাংশে অবস্থিত একটি অঞ্চল, যেখানে ১ম বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। প্রায় ২ লক্ষ মানুষ মারা যায় এসব যুদ্ধে।

[৪] এমিলি ব্রন্টের লেখা একটি গথিক উপন্যাস, যেখানে প্রেম, প্রতিশোধ ও ট্র্যাজেডির সংমিশ্রণ আছে।

পড়ে গেলাম। এই বই এবং তার ভেতরে যে আজব দুনিয়া লুকিয়ে থাকে তার প্রতি আমার প্রেম নিঃসন্দেহে আমার বাবার দান।

বাবা একবার বলেছিলেন, 'তুমি যদি কান পেতে শোনো, তাহলে দেখবে পুরোনো বইগুলো ফিসফিসিয়ে গোপন কথা বলছে।'

তাকের ওপর চামড়ায় বাঁধানো বহু পুরোনো একটা বই খুঁজে পেয়েছিলাম। বইয়ের পাতাগুলো কালের প্রকোপে হলুদ হয়ে গেছিল। সেই বইটাকে কানের কাছে রেখে চোখ বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করেছিলাম। সেই বই কোন গোপন কথা বলবে তা শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই শুনতে পাইনি।

বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী শুনলি?'

আমি চুপচাপ চোখ বুজে শোনার চেষ্টা করছিলাম। তারপর হঠাৎ বললাম, 'সমুদ্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছি,' বইয়ের পাতার ভেতর দিয়ে প্রবাহমান বাতাস যেন আমার কানে সমুদ্রের গর্জন বয়ে আনছিল। বাবা মুচকি হেসে আমার গাল দুটো টিপে দিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বাবা, বইটা কি শ্বাস নিচ্ছে?'

বাবা জবাব দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, গল্পগুলো শ্বাস নিচ্ছে।'

১৯১৮ সালের যে রাত্রে বাবা স্প্যানিস ফ্লু-এ আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন, সেই রাতে আমি তার হিমশীতল হাতটা চেপে ধরে সারারাত তার মাথার কাছে বসে বাবার প্রিয় গল্পটা পড়ছিলাম। চার্লস ডিকেন্সের লেখা *দ্য পার্সোনাল হিস্ট্রি অব ডেভিড কপারফিল্ড*। বোকার মতো ভেবেছিলাম, ওই গল্পের ছোটো ছোটো শব্দগুলো হয়তো বাবাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে।

'পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করতে আমি এমন কাউকে বিয়ে করতে চাই না যাকে আগে কোনোদিন দেখিনি। এসব মান্ধাতার আমলের চিন্তাভাবনা।'

কথাটা বলামাত্র মিসেস ব্যারেটের হাত থেকে ব্রাশটা পড়ে গেল, আর ধাতব জিনিসটা মার্বেলের মেঝেতে পড়ে যে শব্দ করল, তাতে আমার ভাইয়ের মুখে একরকম ঘৃণা আর বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। জোরে কোনো শব্দ তিনি সহ্যই করতে পারেন না।

'এক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান!'

ভদ্রমহিলার হাঁটুর অবস্থা ভালো নয়। তিনবার চেষ্টা করে অবশেষে তিনি ঝাড়নটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা ধাক্কা না মেরে কীভাবে বেরিয়ে গেলেন, সেটাই এখনো আমার কাছে এক রহস্য।

আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বললাম, 'যদি তোমাদের কাছে এতটাই বোঝা হয়ে গিয়ে থাকি তবে আজকেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

মা বললেন, 'তোমার কাছে টাকা আছে? কোথায় যাবে শুনি?' এখন মায়ের

বয়স ষাটের বেশি। মা সব সময় এই পরিবারে আমার আগমনকে একটি 'অবাক করা' ঘটনা বলে অভিহিত করেন। তবে তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় যেন তিনি এ ধরনের অবাক করা ঘটনা বিশেষ পছন্দ করেন না। বয়সে বড়ো অভিভাবকদের অধীনে বেড়ে উঠতে উঠতে সবসময় আমার মনে হতো যে এই বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে কবে আধুনিক দুনিয়াটা দেখব।

জোর দিয়ে বললাম, 'আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। একটা চাকরিও পেতে পারি।'

মা আমার উত্তর শুনে কেঁপে উঠলেন।

চেয়ার থেকে আমি উঠতে যেতেই লিন্ডন আমার হাত চেপে ধরে চিৎকার করল, 'তুই এতটা বেইমান! এত অকৃতজ্ঞ?'

'আমার ব্যথা লাগছে।'

'তুই যদি আমাদের কথা না শুনিস তাহলে আমি আরও কঠোর হবো।'

নিজের হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম ঠিকই কিন্তু ভাই হাত দুটো জোরে চেপে রেখেছিল। মায়ের দিকে তাকালাম। মা তখন মেঝের দিকে একমনে তাকিয়ে রয়েছেন।

অবশেষে বুঝতে পারলাম যে বর্তমানে লিন্ডন এই বাড়ির কর্তা। এই বাড়ির সমস্ত সিদ্ধান্ত সেই নেবে। অস্ফুটে বললাম, 'বুঝেছি।'

'বুঝলেই ভালো, বুঝেছিস? বুঝলেই ভালো।' সে তখনও আমার হাত চেপে ধরে কথা বলছিল। আমি তার মুখের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছিলাম।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি ছেলেটার সাথে দেখা করব।'

'তুই ওকে বিয়ে করবি,' এই বলে সে ধীরে ধীরে আবার হাত ছেড়ে দিল।

আমি নিজের পোশাক-আশাক ঠিক করে বইটা চেপে ধরলাম।

লিন্ডন শীতল দৃষ্টি হেনে জবাব দিল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখিস। আজ সন্ধ্যেবেলা অস্টিনকে আমাদের বাড়িতে খেতে নিমন্ত্রণ করব।'

'ঠিক আছে।' বলে এগিয়ে গেলাম দোতলায় নিজের শোয়ার ঘরের দিকে।

আমি ড্রেসিং টেবিলের ওপরে ড্রয়ার খুলে খুঁজতে খুঁজতে একটা সিগারেট পেলাম—চুরি করে এনেছিলাম মিসেস ব্যারেটের রান্নাঘরের গোপন মজুদ থেকে। জানালাটা খুলে দিয়ে সেই সিগারেট ধরিয়ে সিনেমার অভিনেত্রীদের মতো ধীরে ধীরে লম্বা করে টান দিলাম তাতে। ড্রেসিং টেবিলে বসে ওই

সিগারেটটা সামনে রাখা পুরোনো ঝিনুকের খোলসের ওপর রেখে দিলাম। গত বছর গ্রীষ্মকালে আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী জেনের বিয়ের আগে আমরা সমুদ্রে বেড়াতে গেছিলাম। সেখান থেকেই জিনিসটা জোগাড় করে এনেছি। বর্তমানে মহিলারা ভোটাধিকার পেলেও বিয়েই যেন এখনো তাদের জীবনের অন্তিম পরিণতি।

আমার গলার কাছে চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে সেখানে হাত দিলাম। চুল কেটে ফেলার পর মা প্রায় মুর্ছা যাচ্ছিলেন। বলেছিলাম, 'আমি আর ছোটো বাচ্চা নই।' কিন্তু আমি কি সত্যি সত্যি সেই কথা বিশ্বাস করি? আমার আধুনিক নারী হওয়ার প্রয়োজন। জীবনে ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু টাকা ছাড়া আমি কিই বা করতে পারি? বড়োদের কথা শোনা ছাড়া আমার আর কী উপায় আছে? আর ঠিক সেই সময় বাবার কথাটা মনে পড়ে যায় ... *বই হলো অন্য দুনিয়ার গোপন দরজা।* বইয়ের তাকের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে আরেকটা লম্বা টান দিই।

প্রায়শই আমি নিজের সাথে কথা বলি। নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নেলি ব্লাই এবার কী করবে?' এই আমেরিকান সাংবাদিক জুল ভার্নের গল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে মাত্র ৭২ দিন, ৬ ঘণ্টা এবং ১১ মিনিটে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন। আমার কাছে এই মহিলা দুঃসাহসিকতার পরাকাষ্ঠা। তিনি সবসময় বলেন, সঠিকভাবে ও সঠিক দিকে বল প্রয়োগ করতে পারলে যে-কোনো কাজ করা সম্ভব। আমি যদি একটা ছেলে হতাম তাহলে বিয়ের আগে গোটা ইউরোপ ভ্রমণের প্রস্তাব দিতে পারতাম। বিভিন্ন সংস্কৃতি দেখার জন্য কতকাল ধরে স্বপ্ন দেখছি। এই ২১ বছরে কিছুই করতে পারিনি। কিছুই দেখিনি। বইগুলোর দিকে আবার ফিরে তাকালাম। সিদ্ধান্ত নিলাম সিগারেট শেষ হবার আগেই।

মিস্টার টার্টন আমার বহুদিনের পুরোনো *উদারিং হাইটস* এবং *দ্য হাঞ্চব্যাক অব নটর ডেম* বই দুটো উলটেপালটে দেখছিলেন। তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বই দুটোর জন্য আপনি আমায় কত দিতে পারবেন?'

ভদ্রলোক একটি দোকানের মালিক। অবশ্য সেটাকে ঠিক দোকান বলা চলে না। একটা জানালাহীন লম্বা বারান্দা বলা যায় বড়োজোর। তার পাইপের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে বাতাসের কারণে আমার চোখ দিয়ে জল বেরোতে শুরু করে।

'অনেক চেষ্টা করে বড়োজোর দু পাউন্ড দিতে পারব।'

'এ বাবা, আমার তো আরও বেশি দরকার'

তিনি আমার বাবার পছন্দের *ডেভিড কপারফিল্ড* বইটা দেখলেন। আমি

কিছু বলে ওঠার আগেই তিনি সেটার পাতা উলটেপালটে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন।

‘এটা বিক্রি করব না। ওটার সাথে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।’

‘এইটা বেশ ভালো জিনিস। এটাকে বলা হয় রিডিং এডিশন। ডিকেন্স এই বইগুলো থেকে পাঠকদের গল্প পড়ে শোনাতেন। ভদ্রলোকের মোটা নাক আর ছোটো ছোটো চোখের কারণে তাকে অনেকটা ছুঁচোর মতো দেখতে লাগছিল। তিনি একটি দামি জিনিসের গন্ধ পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

আমি তার লোভাতুর হাত থেকে বইটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বললাম, ‘জানি।’ তবে ভদ্রলোক যেন জিনিসটা কিনেই ফেলেছেন এমনভাবে ওটার গুণগান করতে লাগলেন।

‘পালিশ করা লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো। সুন্দর এডিশন। স্পাইনের কারুকার্য দেখার মতো। প্রত্যেকটি পাতার ধারগুলো চকচক করছে। আসল মার্বেল পেপারের পুস্তানি।’

‘বাবা আমাকে এই বইটি উপহার দিয়েছিলেন। এটা বিক্রির জন্য নয়।’

ভদ্রলোক নিজের চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে একবার মেপে নিয়ে বললেন, ‘মিস...?’

‘মিস কার্লিসল্‌।’

‘মিস কার্লিসল্‌, এই এডিশনের যতগুলো বই আমি দেখেছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে।’

আমি অত্যন্ত গর্ব ভরে বললাম, ‘এই বইয়ের অলংকরণগুলো হ্যাবলট কে. ব্রাউনির করা। আপনি বইয়ের মধ্যে তার ছদ্মনাম অর্থাৎ ফিজ কথাটি দেখতে পাবেন।’

‘এটার জন্য আমি তোমাকে পনেরো পাউন্ড দিতে পারব।’

আমার চতুর্দিকের চরাচর যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। যে-কোনো বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এমনটাই বোধহয় হয়। একদিকে মুক্তি এবং স্বাধীনতার রাস্তা, অন্যদিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল।

‘মিস্টার টার্টন, কুড়ি পাউন্ড দিলে জিনিসটা বেচতে পারি।’

ভদ্রলোক চোখ সরু করে মৃদু হাসলেন। আমি জানতাম যে তিনি ওই দামে বইটা কিনবেন। আমি এও জানতাম, ওই বইটা পুনরুদ্ধারের জন্য আমি নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিতে পারি। তিনি পেছন ফিরতেই ঝট করে *উদারিং হাইটস* নিজের পকেটে ঢুকিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

সেইভাবেই শুরু হয়েছিল আমার বইয়ের ডিলার হিসেবে পথচলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্থা

নয় মাস আগে, ডাবলিনে...

আমি যখন হাফপেনি লেনের সেই লাল ইটের, জর্জিয়ান কায়দায় তৈরি বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। বৃষ্টিতে এমন ভিজেছিলাম যে আমার জ্যাকেট থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে। তখনো সেখানে থাকার কোন চিন্তা ভাবনা করিনি। ফোনের ওপার থেকে ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর খুব একটা আন্তরিক মনে না হলেও আমার কাছে অন্যত্র যাওয়ার উপায় ছিল না। টাকা-পয়সাও বিশেষ ছিল না। গ্রামের বাইরে একটি বাস স্ট্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে এক সপ্তাহ পর দেশের অপরপ্রান্তে ডাবলিনে এসে পৌঁছেছিলাম। কতক্ষণ সেই বাসস্ট্যান্ডে বসে ছিলাম তা আমার মনে নেই। কেউ পাশ দিয়ে গেছিল কিনা, তখন আমার ঠান্ডা লাগছিল না গরম লাগছিল, এসব কিছুই খেয়াল করিনি। তখন মনেপ্রাণে সেখান থেকে সরে পড়তে চাইছিলাম। আর সেই ভাবনাতেই ডুবে ছিলাম। আমি আবার ডান দিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফলে বাসটা যে কখন এগিয়ে এসেছে তা খেয়াল করিনি। পাথরের দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠতে যেতেই আমার পাঁজর জবাব দিল। তবু ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। গাড়ির চালক নিজে নেমে এসে আমাকে মালপত্র তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমি একজন পলাতক আসামী। তবুও ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কোথায় যাবেন?’

‘এই চত্বর ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে রাজি,’ মনে মনে কথাটা ভাবলেও মুখে বললাম, ‘ডাবলিন যাবো।’ সেখানে পৌঁছাতে পারলে হয়তো এই জায়গা থেকে বহু দূরে সরে থাকা যাবে। চলন্ত গাড়ির জানালার ওপারে গ্রামের দৃশ্য সরে সরে যাচ্ছিল। আমি ওই ছোট্ট ছোট্ট জমি, ছোট্ট মফস্বলের স্কুল, গির্জা এবং বারোটা পাবকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম। এখানকার মলিনতা যেন আমার ওপর ছায়া ফেলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ দেখলাম সে আবার আমার ওপর উঠে

এসেছে। হাত দিয়ে মুখটা ঢাকার চেষ্টা করছি। বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলাম, তাই এই দৃশ্য দেখেই চমকে উঠি। সে এত দ্রুত কাজ সারছিল যে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। আসলে আমি নিজের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। আমার মধ্যে যেটুকু আশা বেঁচে ছিল তা বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম। সেই মুহূর্তে জীবনের একটা সার সত্য বুঝতে পেরেছিলাম। এ পৃথিবীতে তুমি একা। কেউ তোমার পাশে নেই। কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে না। মানুষ হঠাৎ করে বদলে যাবে না, তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে তোমাকে নতুন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে শুরু করবে না। তার বদলে তারা যেখানে সুযোগ পাবে সেখানেই আঘাত করবে, যন্ত্রণা দেবে। নিজেকে বাঁচানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মেনু কার্ডের মধ্যে থেকে সবচেয়ে কম দামি খাবারটা দেখে নিয়ে বেয়ারাকে বললাম, 'একটা কফি আর একটা টোস্টেড চিজ স্যান্ডউইচ দেবেন।'

অনলাইনে কোনো বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। তাই একটা আঞ্চলিক খবরের কাগজ নিয়ে তাতে কাজের সন্ধান করতে শুরু করেছিলাম। এক সপ্তাহ হোস্টেলে থেকেই আমার পকেট শূন্য হতে শুরু করেছিল। আর তখনই বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেলাম: *গৃহপরিচারিকা প্রয়োজন, থাকা-খাওয়া ফ্রি*। আমি সেই নম্বরে যোগাযোগ করি এবং পরের দিন একটি বিরাট বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হই। বাড়ির কালো কুচকুচে দরজায় কড়া নাড়তে আরম্ভ করি। যে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসেছিলেন তেমন মানুষ আগে দেখিনি। আমায় বলা হয়েছিল তাকে ম্যাডাম বাউডেন বলে ডাকতে হবে। হীরের কানের দুল পরিহিতা ভদ্রমহিলা যেন টিভির কোনো ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি আমার সাথে তার পুরোনো দিনের গল্প করতে আরম্ভ করেছিলেন। ভদ্রমহিলা সেই সময় বিখ্যাত এক নট্ট কোম্পানিতে নাচ-গান করতেন। তিনি এমন সব নাটকের কথা বলছিলেন যার নাম জন্মেও শুনিনি।

'লোকে বলে আমি নাকি অদ্ভুত। আমি আবার তাদেরকে একঘেয়ে মনে করি। তাই কে কী ভাবল তাতে কিছুই যায় আসে না। যাই হোক, তোমার নামটা যেন কী?'

ভদ্রমহিলার সাথে সিঁড়ি বেয়ে বেসমেন্টের দিকে যেতে যেতে এই নিয়ে তৃতীয়বার জবাব দিলাম, 'মার্থা।' ভদ্রমহিলার হাতে একটা ওয়াকিং স্টিক ছিল। কিন্তু তার হাঁটাচলা দেখে সেটার প্রয়োজন আছে বলে মনে হলো না। আমার মনে হয়েছিল যে তার বয়স আশির কোঠায়। তবে তিনি যেন নিজের বয়সকে

একজায়গায় থামিয়ে দিয়েছেন।

'শেষ যে মেয়েটা এখানে এসেছিল সে বেশ আনন্দেই ছিল।' মহিলা এমনভাবে কথাগুলো বললেন যাতে আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিল।

বেসমেন্টের সিলিংয়ের কাছাকাছি একটা জানালা রয়েছে। এই জানালা দিয়ে রাস্তার পথচারীদের পা দেখা যাচ্ছে মাত্র। তা বাদে গোটা ঘর এতটাই অন্ধকার যে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না প্রায়। ভদ্রমহিলা নিজের লাঠি ব্যবহার করে একটা সুইচ অন করলেন। স্ট্যান্ডে ঝুলানো বাল্ব জ্বলে উঠতেই কয়েক মুহূর্ত চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল। তারপর ঘরের এক প্রান্তে একটি বিছানা এবং তার কোনে একটি আলমারি দেখতে পেলাম। দরজার পাশেই একটা ছোট্ট রান্না করার জায়গা এবং তার বাইরে শাওয়ার সমেত একটি ছোট্ট বাথরুম চোখে পড়ল। ঘরের মেঝের এবং দেওয়ালের অবস্থা তথৈবচ। তবে ঘরের ভেতর কেন জানি না আমার বেশ নিরাপদ মনে হলো। মনে হলো এই জায়গাটা যেন আমার। এই দরজা বন্ধ করে দিলেই বাইরের সমস্ত অবাঞ্ছিত আঘাতের থেকে যেন নিজেকে রক্ষা করা যাবে।

ম্যাডাম বাউডেন ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন?'

জবাব দিলাম, 'দারুণ।'

'সে তো হবেই! আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম।'

'তাহলে চাকরিটা হয়ে গেছে ধরে নেব?'

ভদ্রমহিলা আমার অগোছালো চেহারার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তিনি বোধ হয় আমার মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পাননি। মনে মনে ভদ্রমহিলার ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম। অবশ্য এও হতে পারে যে তিনি সব কিছু দেখেও বিশেষ পাত্তা দেননি।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তবে এতে আবেগে ভেসে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। অন্য কেউ এ কাজের জন্য যোগাযোগ করেনি বলেই তোমাকে নিচ্ছি। এছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। তোমাদের প্রজন্মকে নিয়ে এই এক সমস্যা। কেউ খেটে রোজগার করতে রাজি নয়। এখন সবাই টিকটক্ নিয়ে মজা আছে। বিনা পরিশ্রমে উপার্জন করতে চায়। ভাবা যায়?'

ভদ্রমহিলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কথাগুলো বলে চলেছিলেন। আমি বিছানায় গিয়ে বসতেই নিচের স্প্রিংগুলো নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিল। অবশ্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এখানে থাকলে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না। ঘড়িতে সকাল ৭টার অ্যালার্ম দিলাম। আমার চাকরি-দাত্রী জলখাবারে এলাহি আয়োজন চাইছেন। তাই ফ্রিজে যা আছে তা দিয়েই ভুরিভোজের বন্দোবস্ত করতে হবে। এসব পরে ভাবব। ভেজা জামাকাপড় না পালটেই শুয়ে পড়লাম।

জানালা বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

ঘুম ভেঙ্গে, বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। চতুর্দিকে এত আলো কোথা থেকে এলো? আমি কোথায়? আমার অ্যালার্ম বাজে কেন? ধীরে ধীরে সব মনে পড়তেই নিজের পোশাকের দিকে নজর পড়ল। একজন গৃহপরিচারিকার আদর্শ পোশাক কী হতে পারে সে সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা ছিল না কিন্তু যা পরে আছি সেটা যে একেবারেই নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত। সুটকেস খুলে সেখান থেকে ধূসর রঙের পোশাক বের করলাম। পোশাকটা কখন ব্যাগে ঢুকিয়েছিলাম তা মনে পড়ে না তবে ইস্ত্রী করতে হবে না এমন পোষাক-আশাক বোধহয় বেখেয়ালেই সঙ্গে নিয়েছিলাম। নিজের জামা খুলে সবে প্যান্টের চেইন খুলছি এমন সময় দেখলাম দুটো পা আমার বেসমেন্টের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে। যতক্ষণ না বাদামি রঙের ফিতেওয়ালা জুতোগুলো স্পষ্ট নজরে পড়ল ততক্ষণ দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। জামাটা স্তনযুগলের ওপর চেপে ধরে দিব্যি টের পাচ্ছিলাম যে আমার বুক উত্তেজনায় ভীষণভাবে ধরফর করছে। লোকটা এখানে কী করছে? আমার রাগ উঠে যাচ্ছিল। একটা লাঠি দিয়ে কোনো রকমে জানালাটা খুলে মাথা বার করে বললাম, 'মাফ করবেন।'

কোনো জবাব না পেয়ে বেশ জোরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে কি কিছু সাহায্য করতে পারি?'

'মনে হয় না।'

ভদ্রলোকের ইংরেজি উচ্চারণ শুনে চমকালাম। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে এই পা দুটোর ওপর কোন শরীর নেই। এখনো তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু একটা ধারণা তৈরি করতে পেরেছি। মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। এর জন্য আমাকে অনেক সমস্যাতেও পড়তে হয়েছে। এই ভদ্রলোককে অন্যমনস্ক, অখুশি ও অনুসন্ধিৎসু বলে মনে হলো।

আমি তার পায়ের সাথে কথা বলতে লাগলাম, 'আপনি এখানে কী করছেন?'

'তাতে আপনার কী? আপনি কী করছেন ওখানে?'

'আমি এখানে থাকি। তাই আপনি অন্য জায়গায় গিয়ে উঁকি মারুন।' কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার গলাটা কেঁপে গেল। একজন অচেনা মানুষের সাথে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে না। তবে গোপনীয়তা আমার একান্ত কাম্য। ভদ্রলোক নিচু হয়ে বসলেন। এবার তার মুখ দেখতে পেলাম। তার মুখের সাথে কণ্ঠস্বরের কোনো মিল নেই। মুখের আদল কাটা কাটা। ভদ্রলোকের চোখের মনি

বাদামি কিংবা গাঢ় সবুজ। সেখানে একটা উষ্ণতা রয়েছে। ওঁর চোখের মনি নীলচেও হতে পারে। তার চুলের কারণে স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের চেহারা দেখলেই মনে হয় যেন প্রতি কথায় তিনি ঝগড়া করতে প্রস্তুত।

ভদ্রলোক মশকরা করার ঢঙে বললেন, 'আপনি কি আমায় পিপিং টম বলে খেপাচ্ছেন? আশির দশক থেকে টাইম ট্রাভেল করে এলেন নাকি?'

কেউ আমাকে উপেক্ষা করলে বা ভেঙ্গালে আমার একদম ভালো লাগে না। তার মুখে চোখে ফিচকে হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। ঠোঁটের ভেতর দাঁতগুলো অসমান। ভদ্রলোক বোধ হয় ফুটবল খেলতে গিয়ে সেগুলো ভেঙেছেন। হয়তো একটা পেনাল্টি কিক আটকাতে গিয়ে মুখে বাড়ি খেয়েছেন। আমি মুচকি হেসে চুপ করে গেলাম।

'আপনি যদি কথা বলা না থামান কিংবা যা করছিলেন সেটা বন্ধ না করেন তাহলে পুলিশকে ফোন করতে বাধ্য হবো।'

ভদ্রলোক দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণের ইশারা করলেন।

আমার দিকে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'মাফ করবেন, আমার নাম হেনরি।'

সেই হাতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই ভদ্রলোক হাত গুটিয়ে নিলেন, 'দিব্যি কেটে বলছি, আপনার জানালার দিকে দেখছিলাম না। আমি একটি জিনিস... একটা জিনিস খুঁজছিলাম...'

মনে মনে ভাবলাম, '*নির্ঘাত বানানো গল্প*।'

'কী হারিয়েছেন?'

হেনরি ম্যাডাম বাউডেন এবং তার প্রতিবেশীর বাড়ির মাঝখানের জমিতে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে জবাব দিলেন, 'হুঁ? আসলে ঠিক হারাইনি...' নিজের অবিন্যস্ত চুলে হাত বুলাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

মনে মনে ভাবলাম লোকটা নির্ঘাত অসভ্য। তাকে সে কথা মুখের ওপর বলে দেবো ভাবছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, 'আমি আসলে কঙ্কাল খুঁজছি!'

'এখানে কি কেউ মারা গেছিল নাকি? আমি জানতাম, এখানে এসে থেকেই আবার অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। হে আল্লাহ্...'

ভদ্রলোক আবার মাথা নিচু করে বললেন, 'না না, আপনি যেমনটা ভাবছেন তেমনটা নয়। আসলে আপনাকে কীভাবে যে বোঝাই! বোঝানোটা একটু ঝামেলার...'

কয়েক মুহূর্ত আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম। তিনি বাইরে থেকে আমার দিকে ঝুঁকে রইলেন আর আমি ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে মাথা বার করে রইলাম। এমন সময় ঘণ্টার আওয়াজ হলো।

ভদ্রলোক ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওটা কিসের শব্দ?’

চারদিকে তাকিয়ে দেখি, দেওয়ালে ঝুলছে একেবারে সেকেলে ধরনের একটি ঘণ্টা—একটা সরু তার টেনে নিয়ে গেছে সোজা ছাদের দিকে। চারপাশের দৃশ্য দেখে মনে হলো, যেন আমি নিজেই ঢুকে পড়েছি *ডাউনটন অ্যাবি*[৫]-র এক জীবন্ত সংস্করণে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম তাঁর দিকে—হেনরি।

তারপর তার মুখের ওপর দরাম করে জানালা বন্ধ করে দিতে দিতে বললাম, ‘এক কাজ করুন, যা খুঁজছেন তা অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজুন।’

[৫] *ডাউনটন অ্যাবি* এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ধারাবাহিক টেলিভিশন সিরিজ, যার পটভূমি বিশ শতকের শুরুর দিকে; সিরিজটি এক অভিজাত পরিবার ও তাদের গৃহকর্মীদের জীবনের গল্প তুলে ধরে।

তৃতীয় অধ্যায়

হেনরি

গত দুদিনের মতো একই পাবে, ঠিক সেই একই কোণে—এক পিন্ট গিনেস[৬] নিয়ে, ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিলাম। দিনের পর দিন সেই একই টেবিল, একই কাঠের বার, আর আমার প্রিয় স্টুলটা—কোণের দিকে একটু লুকানো। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছিল 'টেইনটেড লাভ', আর আমি বার-টেবিলের কাঠে জুতার মাথা দিয়ে ছন্দ মিলিয়ে দিচ্ছিলাম টুকটুক করে।

গতকালের নোটটা পড়ছিলাম:

মানুষের জীবনের প্রায় ছয় মাস কেবল হারানো জিনিস খুঁজতে খুঁজতেই কেটে যায়। একবার এক ইন্সুরেন্স কোম্পানি একটা সার্ভে করেছিল। তাতে জানা যায় যে গড়ে একজন মানুষ প্রতিদিন প্রায় নয়খানা জিনিস হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ষাট বছর বয়স হওয়ার আগেই আমরা প্রায় দুই লক্ষ জিনিস হারাই। যদি বইয়ের কথা বলা হয় তবে না জানি কত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, পেপার ব্যাক বই, হাতে লেখা খসড়া হারিয়ে গেছে অথবা ইতিহাসের পাতায় গা ঢাকা দিয়েছে। কত অজানা গ্রন্থাগার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। যেমন গোবি মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত ডানহুয়াং লাইব্রেরি প্রায় এক হাজার বছর বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তারপর হঠাৎ করেই একদিন সেটা আবিষ্কার হয়। একজন সাধক একটি পুরোনো দেওয়ালে হেলান দিয়ে ধূমপান করতে করতে সেই দেওয়াল ভেঙে পড়ে যান এবং আবিষ্কার করেন এই গ্রন্থাগার। সেখানে তিনি প্রাচীন বিভিন্ন পুঁথি আবিষ্কার করেন। প্রায় ১০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত ডাঁই করে রাখা ১৭ টা ভিন্ন ভাষায় লেখা পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। কে বলতে পারে তার ভেতর থেকে কোন অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হবে? কিংবা কোন হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে?

আমি যেখানে থাকছি এবং খাচ্ছি তা আমার সাধ্যের বাইরে। আরও একরাত সেখানে কাটিয়ে এমন এক গ্রন্থাগারের কথা লিখছি যার বাস্তব অস্তিত্ব

[৬] গিনেস হলো বিশ্ববিখ্যাত একটি আইরিশ স্টাউট বিয়ার, যার গাঢ় রং ও মসৃণ, ক্রিমের মতো ফেনা একে আলাদা করে চেনায়। এর স্বাদ গাঢ়, একটু কড়াও বটে।

নেই। কোনোদিন অস্তিত্ব ছিল কি? পৃথিবীর অন্যতম সফল দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রাহক মিস ওপালিন গ্রের মধ্যে কথোপকথনের একটি চিঠি আমার এই লেখার একমাত্র রসদ। তারা একটি হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি নিয়ে সেই চিঠিতে কথা বলেছিলেন। একমাত্র নিলাম ঘরেই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। আর সেখানেই আমি এমন একটা অদ্ভুত জিনিস হাতে পেয়েছিলাম। চিরকাল এমন একটা সংগ্রহের সন্ধান করেছি যা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রাহকের তালিকায় আমার নাম স্বর্ণালী অক্ষরে খোদাই করে দেবে। অনেক খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে এইরকম একটা জিনিস হাতে পেয়েছি।

বেশ কয়েকদিন আগেই আমার ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। আসলে অনুপ্রেরণা যে-কোনো দিক থেকে কিংবা যে-কোনো রূপে আসতে পারে। আয়ারল্যান্ডে থেকে যাওয়ার পেছনে আমার একমাত্র অনুপ্রেরণা ছিল এই যে কারো যেন মনে না হয় আমি বিফল হয়েছি। অথচ আমি এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই সে কথাই ভেবেছিলাম। কেউ যদি তোমাকে দাম না দেয় তাহলে তুমি নিজের দাম কীভাবে দেবে? এ বিষয়ে আমি আমার বাবাকে দোষারোপ করি। বাবার কথা মনে করলে প্রথমেই একটি বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে আসে। তিনি আমাকে একবার আমার নতুন খেলনা মাইক্রোফোন নিয়ে গান গাইতে বলেছিলেন। কী গান গেয়েছিলাম তা এখন মনে নেই। তবে যেটা মনে আছে সেটা হলো বাবা আমার গান শুনে মাদকাসক্ত জানোয়ারের মতো হেসেছিলেন। বাকিরাও সেই অট্টহাসিতে বাবার সাথে যোগ দিয়েছিল। আমি এতটাই অপমানিত বোধ করেছিলাম যে কখন পেচ্ছাপ করে ফেলেছি টেরই পাইনি।

বাবা হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনো রকমে বলেছিলেন, 'ব্যাটা মুতে ফেলেছে দেখছি!'

তারপর কী হয়েছিল তা আর মনে পড়ে না। হয়তো মা এসে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে সবাই আমাকে ছিঁচকাঁদুনে বলে খ্যাপাতো। আমার বোন লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে জন্মেছিল। বাবা তাকে খ্যাপাতেন না। আমরা সবাই ওকে সমীহ করতাম। ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি যে সবচেয়ে বোকা সেটা আরও দৃঢ় প্রতিপন্ন হয়েছিল।

রসেনবাকের চিঠিটা হাতে পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনা চলেছিল।

হঠাৎ করে সব এমন বদলে গেল যেন আমার সমস্ত পুরোনো স্মৃতি লাইব্রেরির ঘরের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে। লাইব্রেরিতে এত বই পড়তাম যে অনেকের ধারণা হতো আমি ওখানেই কাজ করি। মাঝেমধ্যে আমার নিজেরও তেমনটাই মনে হতো। অন্যান্য লোকেদের লাইব্রেরিতে কীভাবে কাজ করতে হয় সে সম্পর্কে যখন জ্ঞান দিতাম তখন নিজেকে বিরাট বিজ্ঞ বলে মনে

হতো। মা ব্যাপারটা জানতে পেরে রেগে আগুন হয়ে গেছিলেন।

'তোর পড়াশোনার পেছনে এত খরচা করলাম! তুই পরীক্ষাতেই বসিসনি!'

হ্যাঁ আমি সেই টাকা দিয়ে লন্ডনের রেয়ার বুক স্কুলে কোর্স করেছিলাম। তাই সমস্ত টাকা নষ্ট হয়েছে, এমন ভাবার কোন কারণ ছিল না। আমি নিজের জন্য একটা পেশা বেছে নিয়েছিলাম। যদিও অধিকাংশ লোক পুরোনো বইয়ের প্রতি এই মোহকে পেশা বলতে নারাজ।

তবুও এর আগে এরকম কিছু হাতে পাইনি। আমি তো আর ইন্ডিয়ানা জোন্স নই। আমার বোন লুসিন্ডা একবার বলেছিল আমি নাকি কুয়োর ব্যাঙ। এখন বোঝা যাচ্ছে কে আসল কুয়োর ব্যাঙ। মদের খেয়ালে হেসে উঠলাম। সেই গ্রন্থাগার খুঁজে বের করার জন্য বা তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই হাফ পেনি লেনে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে ফেলেছি। একটু নড়তেই একটা ছায়া দেখতে পেলাম।

সেই মেয়েটা।

মেয়েটা কোথা থেকে এসেছে? সে যখন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তখন তার চোখ দুটো দেখেছিলাম। ঐরকম নীল চোখের চাউনি এর আগে কখনো দেখিনি। আমি তার দিকে চেয়েছিলাম। তাকে দেখে ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিল। তারপর বুঝতে পারলাম, সে আসলে ভয় পেয়েছে। তার মুখের মধ্যে কোনো ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও গালের কাছে খানিকটা আভা রয়েছে। নিজের রাগ প্রকাশ করতে চেয়েও পারেনি সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি দেবদূত বিপদে পড়েছে। তার সাথে আরও কথা বলতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু কীই বা বলতাম? আপনি একটা হারিয়ে যাওয়া বইয়ের দোকান দেখেছেন? আপনার বাড়ির তলাতেই কি সেই দোকান থাকা সম্ভব? আজ রাতে আমার সাথে খেতে যাবেন? সে যখন বুকের ওপর জামাটা চেপে ধরে জানালা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল তখন তার গোটা পিঠ জুড়ে একটা উল্কি দেখতে পেয়েছিলাম। একটা গোটা ছবি না হলেও ডেড সি স্ক্রোলের[৭] মতো অজস্র ছোটো ছোটো অক্ষর যেন তার পিঠে লেখা রয়েছে।

আমরা হঠাৎ করেই কিছুক্ষণ কথা বলে ফেলেছিলাম। তবে তার মধ্যেই বুঝতে পেরেছি যে এমন মহিলা এর আগে আমি দেখিনি। আমার সাথে দেখা হলে যে-কোনো মহিলাই বিরক্ত হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আমার ধারণা এই মেয়েটি ওই বইয়ের দোকানের ব্যাপারে কিছু না কিছু জানে। তাই যেভাবেই হোক মেয়েটিকে পটাতে হবে।

---

[৭] ডেড সি স্ক্রোলস, যেগুলো কুমরান গুহার পাণ্ডুলিপি নামেও পরিচিত। এটা একগুচ্ছ প্রাচীন ইহুদি পাণ্ডুলিপি, যেগুলোর উৎস সেকেন্ড টেম্পলার যুগে (৫১৬ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)। এই মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলি ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে অভূতপূর্ব গুরুত্ব বহন করে—ইহুদি সমাজ, বিশ্বাস ও পাঠপ্রথা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে বি অ্যান্ড বি-র সরু বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দুদিকের দেওয়ালে দম বন্ধ করা ওয়ালপেপার সাঁটানো রয়েছে। তার ওপরে ফ্রেমে বাঁধানো অন্তত পাঁচটি পোপের ছবি পরিবেশটিকে করে তুলেছে আরও বদ্ধ। কমলা রঙের ফুল কিংবা বাদামি কার্পেট এতটুকু স্বস্তি দিতে পারছে না।

'তুমি কি চা খাওয়ার জন্য ফিরে এসেছো?'

হিলডা অজেনের মতো করে নোরা তাকালেও তার কণ্ঠস্বর এতটাই ডাবলিনের অনুকূল যা অন্য কারোর গলায় শোনা যায় না। সে এমন এক মানুষ যে সব দেখে ফেলেছে। এক হাত ভাঁজ করে আরেক হাতে সিগারেট ধরে সে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন কোনো কিছুতেই সে আর আশ্চর্য হবে না। এমন মানুষদের আমি ঈর্ষা করি। এই মুহূর্তে যদি হঠাৎ পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটে তাহলেও সে নিজের হাতের সিগারেট এবং মাথায় রোলার জড়িয়ে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকবে যেন কিছুই ঘটেনি। আর পরক্ষণেই চা আর ডিম ভাজা করতে এগিয়ে যাবে।

'ধন্যবাদ নোরা। এখন চা লাগবে না। আমি পাবে পাই আর চিপস খেয়েছি।'

এর আগে কেউ আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়নি। অধিকাংশ সময় আমি কী খাব এবং আমার ওজন কেন কমে যাচ্ছে এই নিয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে।

সে বলল, 'যাক, তাহলে এখন তোমার কিছু খেতে হবে না। কাল সকালে ভালো আইরিশ কফি খেও।'

নম্রভাবে ঘাড় নেড়ে সিঁড়ি বেয়ে সুন্দর পর্দা আর চকচকে চাদর পাতা বিছানাওয়ালা আমার ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। এত সাজসজ্জা সত্ত্বেও বাড়িটা বেশ পছন্দ হয়েছিল আমার। নিজের বাড়ির আমলে হলেও অস্বস্তি হয়নি। আসলে হয়তো এটা নোরার গুণ যে সে আপনার সাথে এমন ব্যবহার করবে আপনার মনে হবে আপনারা একে অপরকে কত বছর ধরে চেনেন। এ পরিবারে তিনটে কুকুর আর এক গৃহকর্তা আছেন ঠিকই তবে তাদের সামনে আনা হয় না। অবশ্য তা সত্ত্বেও আপনার মনে হবে আপনি এই বাড়িরই সদস্য।

প্রথম রাতে আমার বাথরুম দেখাতে দেখাতে সে বলেছিল, 'আমার বর শেডে আছেন,' বাড়ির পেছন দিক থেকে একটা হাতুড়ির শব্দ ভেসে আসায় সে আবার বলে, 'ওকে যদি ওখানেই সারা জীবন রেখে দিতে পারতাম তাহলে ভালো হতো,' কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা।

নোরা নিজের অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বলে, 'কাউন্সিলের তরফ থেকে আপনার জন্য একটা চিঠি এসেছে। কাজের চিঠি বলে মনে হচ্ছে। আমি পড়িনি।' তবে তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো যে সে ওই চিঠি পড়ে ফেলেছে।